ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা,
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের*

Land Management System of Bangladesh. Mohammad Abdul Qader

Abstract: This article attempts to evaluate the land management system of Bangladesh. Almost 80% people of Bangladesh live in rural areas and 70% people depends upon land. So making the land management system effective a good number of laws and rules should have to be published. But during the British period rules and regulations on effective land management system was totally absent. After emergence of Pakistan, The State Acquisition and Tenancy Act 1950 has been introduced for abolishing the rule of Zaminders and to establish government control upon the tenants. So the Board of Revenue has formulated "The Government Estates Manual –1958". The entire land management system of Pakistan period was totally directed by this Manual. After the independence of Bangladesh, people oriented land management system was highly needed. In this article land management process of Bangladesh has been discussed elaborately. Which registers should be maintained in the offices relating to the land management system and return procedure thereof, has been discussed in the article with due care. Accounts procedure and the deposit system has also been discussed exclusively in this article.

বাংলাদেশের মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় প্রায় বারো কোটি মানুষ বসবাস করে। অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে প্রায় ৮০০ জন মানুষ বসবাস করে। শহরগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব কোন কোন এলাকায় ৫০০০ জনের বেশী হলেও বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে এখনও ৮০% লোকের বসবাস। বর্তমানে এদেশের মানুষের পেশাগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলেও এখনও মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৭% লোক কৃষির উপরই নির্ভরশীল । ভূমির উপরে এরূপ নির্ভরশীলতার কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনা তথা ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিবিধান সম্বন্ধে প্রতিটি নাগরিকের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ভূমি মালিকানার ধারণা বিকশিত হতে থাকে। আদিম সমাজে মানুষ বনে চড়ে বেড়াত, গাছের ফলমূল খেত এবং বন্য পশুপাখী শিকার করে জীবনধারণ করতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবন যাত্রায় পর্যায়ক্রমে জটিলতা দেখা দেয়। মানুষ তখন চাষ উপযোগী জমির সন্ধান শুরু করে। নদী তীরবর্তী উর্বর ভূমি এবং বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ ভূমির প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে থাকে। গৃহপালিত পশু পালনের জন্য চারণ ভূমি হিসাবে সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা ভূমির প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

---

* উপ পরিচালক, বিপিএটিসি।

আর এজন্যই ভূমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু হয় মানুষের প্রচেষ্টা । সংগত কারণেই ভূমি বন্টন এবং ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন এসে যায়। অতীত কালে ভূমির যথাযথ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সার্ভে ও সেটেলমেন্টের মাধ্যমে ভূমি বন্টন প্রক্রিয়ার ইতিহাস তেমন জোড়ালো ভাবে পাওয়া যায় না। এজন্য আমরা এটুকু অন্তত ধারণা করতে পারি যে, জমির মালিকানা মূলতঃ জমির দখল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জমি দখল করে যিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিকে চাষোপযোগী করে জমি চাষ করে উৎপাদন করতেন তিনি রাজাকে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ প্রদান করে জমির দখলীস্বত্ব ভোগ করতেন। গোষ্ঠিগতভাবে বা সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাসের তাগিদে গ্রাম ব্যবস্থা বিকশিত হবার পরে গ্রাম প্রধান বা পঞ্চায়েতকে গ্রামের শান্তিশৃখলা রক্ষার জন্য চাষীরা উৎপন্ন ফসল থেকে একটি অংশ দিতে শুরু করে এবং তার মাধ্যমেই রাজার প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে থাকে। যেসব পরিবার বেশী এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করে অনেক আবাদী জমি সৃষ্টি করতে পেরেছিল তারা তা পত্তন দেয়া শুরু করে। এভাবে জমির প্রজাপত্তনী প্রথার উন্মেষ ঘটে।

মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমনের পরে তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বেশ কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলেও স্থানীয় রীতি নীতি অনুযায়ী স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনার লক্ষ্যে আলাউদ্দীন খিলজী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মচারীদের ক্ষমতা খর্ব করনে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মচারীদের বিলাসবহুল জীবন যাপন তথা দুর্নীতি বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা যাচাই করার লক্ষ্যে জমি জরিপ করে জমির উৎপন্ন ফসলের সর্বোচ্চ এক চতুর্থাংশ খাজনা ধার্যের ব্যবস্থা করেন। খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে চাষীদের কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ হিসাবে "তাকাভী ঋণ" প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর শাসন ব্যবস্থার কিছুটা ছোঁয়া বাংলাদেশেও এসে লাগে। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার এনে তা যুগোপযোগী করার জোড়ালো প্রচেষ্টা শুরু হয় মূলত সম্রাট শেরশাহের আমলে। তাঁর আমলে চাষোপযোগী ভূমিকে আইনানুগ স্বীকৃতি দেয়ার লক্ষ্যে পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রবর্তন করা হয়। পাট্টা হলো সরকার বা জমিদার কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে জমি ভোগ দখল করার অধিকারপত্র, যাতে জমির পরিচিতি, মূলতঃ জমির বর্ণনা অর্থাৎ জমির চৌহদ্দি, পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ, চাষীর অধিকার সম্বলিত শর্তাবলীর উল্লেখ

থাকতো। আর কবুলিয়াত হলো এক ধরনের দলিল যা সরকার বা জমিদারের নিকট হতে লিখিত পাট্টা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রজা পাট্টায় প্রদত্ত শর্তসমূহ গ্রহণ করে কবুলিয়ত বা সম্মতি প্রদান করতেন। এই সম্মতি পত্রই মূলতঃ কবুলিয়ত নামে পরিচিত। কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার মাধ্যমে চাষী ভূমির উপর মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি লাভ করে এবং আদালত কর্তৃক ভূমি মালিকানা ও দখল সংক্রান্ত রায় পাওয়া সহজতর হয়। এ সময়ে আবাদী জমি সরজমিনে জরিপ করে ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আমিন এবং কানুনগো নিয়োগ করা হয়। মূলতঃ ভূমি জরিপের লক্ষ্যে নক্শা প্রস্তুত করে খানা পুরনের কাজ করা হয়। কানুনগো খানাপুরি রেকর্ডের সময় মালিকদের নিকট সরজমিনে গিয়ে বুঝানোর (বুঝারত) কাজ করতেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা নিতেন। মুঘল শাসনামলে শায়েস্তাখান, মীর জুমলা, মুর্শিদকুলি খাঁন প্রমুখ শাসকবর্গ বাংলাদেশের আবাদী জমির নক্শা ও রেকর্ড প্রস্তুত করার জন্য যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। সে সময়ে সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ সুবে বাংলাকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে তার অধীনে পরগনা ও মহাল সৃষ্টি করা হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দেওয়ান এবং তার নিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ বিভাগীয় পর্যায়ে আমল গুজার বা আমি (কালেক্টর) এবং পরগনা পর্যায়ে শিকদার রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতেন। তাছাড়াও কানুনগো, পটোয়ারী ও আমীন নিয়োগ করা হতো। একদিকে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া উন্নতকরণ অপরদিকে বন্যা ও খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কৃষকদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তাকাভী ঋণের ব্যবস্থা করার ফলে কৃষি উৎপাদন পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিংবদন্তী আছে যে, শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত ।

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকে। সে সময়ে শাসকবর্গ দেখতে পান যে তাদের রাজস্ব আয়ের মূল উৎস হলো ভূমি রাজস্ব। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমকে পরাজিত করে নিরংকুশভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা সালামীর বিনিময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। প্রথম দিকে তারা মোহাম্মদ রেজা খানকে নায়েবে দেওয়ান নিযুক্ত করে প্রচলিত রীতিনীতি মোতাবেক ভূমি রাজস্ব আদায় এবং ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক ভাবে চালাতে থাকে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের এদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার সুযোগে

এদেশের রায়তগণ ভূমি রাজস্ব আদায় এবং কোম্পানীকে প্রদানের ক্ষেত্রে কারচুপি এবং তহবিল তছরুপের ঘটনা ঘটায়। অন্যদিকে বাংলা ১১৭৬ সনে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলায় মারাত্মক এক মনন্তর হয় যাতে বাংলার প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। ফলে রাজস্ব আদায়ে ব্যাপকভাবে ভাটা পড়ে। মূলতঃ মুনাফা লাভ করা ছিল বৃটিশদের মূল লক্ষ্য সেজন্য তারা এদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ দেওয়ানী পরিচালনার ভার সরাসরিভাবে গ্রহণ করে। ভূমি রাজস্ব আদায় জোরদার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রকৃতি জোরালো করার লক্ষ্যে নায়েবে দেওয়ান রেজা খানকে অপসারণ করে প্রতিটি পরগনায় একজন রেভিনিউ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম গর্ভনর নিযুক্ত হয়ে ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার জন্য সুপারভাইজারের স্থলে রেভিনিউ কালেক্টর নিয়োগ করেন।

এদিকে নিলামের মাধ্যমে প্রথম ১ সালা ও পরে ৫ সালা এবং লর্ড কর্নওয়ালীসের আমলে ১০ সালা বন্দোবস্তি প্রথা চালু করা হয়। কিন্তু এসব বন্দোবস্ত প্রদানের ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন পরিবর্তন না আসায় ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রস্তাবিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা একটি নির্দিষ্ট এলাকার জমি নির্ধারিত খাজনার বিনিময়ে এলাকার বিত্তবানদের নিকট চিরদিনের জন্য মালিকানাস্বত্ব প্রদানের ব্যবস্থা নেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষকরা আবহমানকালের স্বত্ব হারিয়ে ফলে। এভাবে জমিদারী ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে আরও জোরালো হতে থাকে এবং প্রজাদের উপর নিপীড়ন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ব্যবস্থায় কৃষকদের দখলীয় জমি নির্দিষ্ট খাজনা দিয়ে ভোগ দখলের সুযোগ রাখা হয়। জমিদারী এলাকার বহির্ভূত জমি বন্দোবস্ত দেয়া এবং খাজনা আদায়ের জন্য কালেক্টরেটে খাস মহল নামে একটি শাখা খোলা হয়। ভূমি রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশকিছু নির্বতনমূলক আইনও প্রণয়ন করা হয়। সূর্যাস্ত আইন, রেন্ট এ্যাক্ট, রেন্ট কমিশন, ফ্লাউড কমিশন প্রভৃতি আইন প্রণয়ন ও কমিশন গঠন করা হয়। রাজস্ব বাবদ আয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য প্রতি বৎসরের ৩০শে চৈত্র তারিখের মধ্যে নির্ধারিত বার্ষিক রাজস্ব কোন জমিদার পরিশোধ করতে না পারলে ৩০শে চৈত্র সূর্যাস্ত পরে সংশ্লিষ্ট জমিদারী রাজস্ব বকেয়া দায়ে নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত এই আইনের ফলে জমিদারেরা প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের জন্য নানাভাবে উৎপীড়ন বৃদ্ধি করে এবং তাদের

নিকট থেকে খাজনা আদায় করে কোম্পানীর রাজস্ব পরিশোধের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বৃটিশ আমলে মূলতঃ যেসব আইন প্রণীত হয়েছিল তা নির্বতনমূলক হওয়ায় ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। অর্থাৎ বৃটিশ আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য যেরূপ আইন বা বিধিবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল তদরূপ আইন বা বিধিবিধান প্রণীত হয়নি। বৃটিশ আমলে মুলতঃ ইংরেজ শাসকবর্গ এদেশকে তথা এদেশের মানুষকে শোষণ করার মানসে নিবর্তনমূলক আইন কার্যকরী করার জন্য চেষ্টিত ছিল বিধায় সেই সময় তারা ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন কোন আইন বা বিধি প্রণয়ন করেনি।

বৃটিশ শাসনের অবসানের পরে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ প্রণয়ন করে যাবতীয় মধ্যস্বত্ব বিলুপ্ত করে রায়তগণকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনায়ন করা এবং ভূমিতে রায়তের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সকলের ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা নেয়া হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল ও জমিদারী অধিগ্রহণের ফলশ্রুতিতে জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার উপযোগী প্রশাসনিক অবকাঠামো সৃষ্টি ও নীতিমালা জারীর লক্ষ্যে তৎকালীন রাজস্ব রোর্ড "The Government Estates Manual, 1958" প্রণয়ন করে। জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং রায়তগণ হতে খাজনা আদায়ই সরকারের প্রধান দায়িত্বে পরিণত হয় ফলে জমির খাজনা ধার্যকরণ এবং আদায়ের কর্ম সম্পাদানের মাধ্যমে জেলা কালেক্টরগণ কার্যতঃ জমিদারগণের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভূমি ব্যবস্থাপনা জনকল্যাণমূখী করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কিছু আইন ও বিধি প্রণীত হয়েছে। যেমনঃ

(ক) খাস জমিতে ছিন্নমূল ও বাস্তুহীন পরিবারসমূহকে পূণর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছ গ্রাম/ আশ্রায়ন প্রকল্প সৃজনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।
(খ) ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ জারী।
(গ) ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ - ১৯৮৪ প্রণয়ন।
(ঘ) ঋণ সালিসী আইন- ১৯৮৯ প্রণয়ন।
(ঙ) ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন।

(চ) মহামান্য রাষ্টপতির সভাপতিত্বে জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদের গঠন।
(ছ) ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন।
(জ) ভূমি আপীল বোর্ড গঠন।
(ঝ) জেলা ভূমি সংস্কার টাস্কফোর্স গঠন।
(ঞ) উপজেলা পর্যায়ে ভূমি সংস্কার কমিটি গঠন।

উপরোক্ত বিভিন্ন বিধি বিধান প্রণয়ন ও কমিটি গঠনের মাধ্যমে সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। এই লক্ষ্যেকে সামনে রেখে The Government Estates Manual, 1958 এর পরির্বতে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ম্যানুয়াল অনুযায়ী বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সাংগঠনিক স্তরসমূহ

ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিষয়টিতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিবাহী অর্থাৎ রাষ্টপতিকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে "জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদ" সৃষ্টির কথা ম্যানুয়াল এর প্রথমদিকে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসনব্যস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উক্ত পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়াবলী বিশদভাবে পর্যালোচনার জন্য "জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিষদ স্থায়ী কমিটি" গঠন করে সামগ্রিকভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মাঠপর্যায়ের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন মনিটরিং এর লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই বোর্ড সরকার কর্তৃক অর্পিত ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করে, প্রয়োজনে কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের বিধান অনুসারে বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ভূমি প্রশাসন বোর্ড বিলুপ্ত করে একটি সার্বক্ষণিক ভূমি আপীল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ভূমি আইন সংক্রান্ত সমুদয় আপীল নিষ্পত্তির জন্য এটাই সর্বোচ্চ

প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল। এই বোর্ডের রায় বিভাগীয় কমিশনার, জেলা কালেক্টর ও তার অধীনস্থ সকল কর্মকর্তার উপরে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে।

জেলা পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ও দায়িত্ব জেলা কালেক্টরের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। জেলা প্রশাসকের এই দায়িত্বাবলীর তদারকী ও যথাযথ কার্যকরতার সার্বিক নির্দেশনায় থেকে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কাজ করেন।

জেলা কালেক্টর বিশেষতঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সার্বিক নিদের্শনায় ও তত্ত্বাবধানে থেকে একজন রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) কাজ করেন। তিনি মূলতঃ জেলায় কর্মরত সকল অধস্তন ভূমি ব্যবস্থাপনা অফিসারদের কাজ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন, ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ধার্যকরণ ও আদায় তাঁর প্রত্যক্ষ কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম।

উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে (১৯৮২ ইং এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী) সাবেক মহকুমা প্রশাসক ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যে সব সার্বিক দায়িত্ব পালন করতেন তা ইউএনওগণের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এদিকে উপজেলা পর্যায়ে নিকার অনুমোদিত জোনাল জরিপ ব্যবস্থায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নেতৃত্বে জরিপ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত অবকাঠামোর প্রবর্তন করা হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে প্রণীত রেকর্ড চূড়ান্তকরণের পরে তদনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় এবং পুনরায় জরিপ না হওয়া পর্যন্ত তা সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস গ্রহণ করবে।

তহশীল অফিস নাম পরিবর্তন করে প্রতি ইউনিয়ন একটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থাপন করে চিরাচরিত প্রথায় খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এখন থেকে এই ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলি ভূমি সংস্কারসহ সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করে সব ধরনের কার্যক্রমকে যুগোপযোগীভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলি যথাযথ ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

১৯৭৬ সালে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ জারী করে সরকার জমির উপর থেকে সকল প্রকার খাজনা/সেস ইত্যাদি রহিত করে প্রত্যেক মালিক পরবিার/সংস্থার মালিকানাধীন মোট জমির ভিত্তিতে প্রগতিশীল হারে ভূমি উন্নয়ন কর প্রবর্তন করেছেন। এ লক্ষ্যে জমিকে কৃষি ও অকৃষি হিসাবে বিভক্ত করে পৃথক হারে কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অকৃষি জমিকে আবার শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং আবাসিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য জমি হিসেবে শ্রেণী বিন্যস্ত করে কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিষয় তা হল, সাব পদ্ধতি অনুসরণ করে ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাস জমি ব্যতীত সকল শ্রেণীর ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের জমি ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কর আরোপযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার্য কবরস্থান, শ্মশান ও উপাসনালয়কে ভূমি উন্নয়ন কর মুক্ত বলে ঘোষণা করতে পারবেন। কিন্তু পারিবারিক গোরস্থান বা উপাসনালয়ের ক্ষেত্রে এরূপ কর মুক্ত আদেশ দেয়া যাবে না।

তহশীলদার প্রত্যেক মালিক পরিবার বা সংস্থার জন্য প্রথমে মৌজাওয়ারী ও পরে ইউনিয়নওয়ারী (তহশীল এলাকা) একটি কৃষি জমির সাময়িক কর নির্ধারণী তালিকা প্রণয়ন করবেন। ইউনিয়ন ভূমি অফিসে রক্ষিত এক নম্বর ও দুই নম্বর রেজিষ্টার, রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৬/১৯৭২ এবং ৯৮/১৯৭২ মোতাবেক ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জমির বিবরণের ভিত্তিতে প্রথমে প্রতিটি মৌজার প্রত্যেক মালিক পরিবার/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ ও বিবরণ প্রণয়ন করে দুই নম্বর রেজিষ্টারে নিজ বাসস্থান মৌজায় তাহার নামীয় হোল্ডিং এর মন্ত ব্য কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে। মৌজাওয়ারী মালিক পরিবার/সংস্থার জমির বিবরণ প্রণীত হওয়ার পরে তা তুলনামূলক পর্যালোচনা করে এই ইউনিয়নওয়ারী তালিকার ২টি কপি প্রণয়ন করে ১টি কপি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এবং অন্যকপি সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। ইউনিয়নওয়ারী ও উপজেলাওয়ারী কর নির্ধারণী তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তার এলাকার সার্বিক তদারকীর দায়িত্বে থাকবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তার জেলাধীন সকল উপজেলাওয়ারী কর নির্ধারণী তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজ তদারকী করবেন।

খাস কৃষি জমির বন্দোবস্তি প্রক্রিয়া

কৃষি জমির সুষম বন্টনের মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ একটি মৌলিক অঙ্গীকার। খাস জমি চিহ্নিত করে ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন চাষী পরিবারের মধ্যে খাস কৃষি জমি বিতরণ ও বাস্তুহারা পরিবারসমূহের মধ্যে বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য অকৃষি জমি বন্টন ইত্যাদি জাতীয় ভূমি সংস্কার কার্যক্রমের প্রাথমিক স্তর হিসাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯০ এর ৪১ নং বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিধি ৪২ এ খাসজমির সংজ্ঞা এবং উৎস সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর বন্দোবস্তিযোগ্য খাস কৃষি জমি যা কিনা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনযোগ্য হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা ৪৩ নং বিধিতে দেয়া হয়েছে। খাসজমি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক তহশীলদার তার এলাকার মৌজাম্যাপ সরজমিনে পরীক্ষা করে নীতিমালায় বর্ণিত ছক-২ মোতাবেক সকল শ্রেণীর খাসজমির একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন। প্রতিটা মৌজার খাসজমির বিবরণসহ খাসজমি চিহ্নিত করে একটি স্কেচম্যাপ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট পাঠাতে হবে। এরই ভিত্তিতে খাসজমি বন্দোবস্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) উক্ত বিবরণী অফিস রেকর্ডের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ও সত্যতা যাচাই করে সন্তুষ্ট হলে খাসজমি পৃথক করবেন। অতঃপর তিনি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করবেন ও তা ইউএনও কর্তৃক স্বাক্ষরের পর কালেক্টরের নিকট পাঠাবেন। তিনি আপত্তি (যদি থাকে) শুনবেন এবং নিশ্চিত হয়ে খাসজমি বন্দোবস্তি অনুমোদন করবেন।

খাসজমি কারো অবৈধ দখলে থাকলে, উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দখলমুক্ত করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহাকারী কমিশনার (ভূমি) জরুরী ভাবে মামলা সৃজন করবেন এবং জেলা কালেক্টরের অনুমোদনক্রমে আইন অনুযায়ী অবৈধ দখলকারীকে উচ্ছেদ করবেন। খাসজমি বন্দোবস্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শ্রেণীর পরিবারসমূহ ভূমিহীন পরিবার বলে গণ্য হবেঃ

(ক) যে পরিবারের বসত বাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

(খ) যে পরিবারের বসতবাড়ী আছে, কিন্তু কৃষি জমি নাই অথচ পরিবারটি কৃষি নির্ভর , এবং

(গ) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি উভয়ই আছে, কিন্তু মোট জমির পরিমাণ ০.৫০ একরের কম অথচ পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

কৃষি নির্ভর বলতে ঐ পরিবারকে বুঝাবে যে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য কৃষি শ্রমিক হিসাবে নিজ বা অন্যের জমি চাষ করে। খাসজমি বন্দোবস্তি প্রদানের লক্ষ্যে দরখাস্ত আহবান পূর্বক দরখাস্ত বাছাই করে ভূমিহীনদের মধ্য হতে বন্দোবস্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রাধিকার প্রদান করে তালিকা তৈরী করতে হবে। অতঃপর বিধি মোতাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বন্দোবস্তি প্রদানযোগ্যদের তালিকা কালেক্টরের নিকট পাঠিয়ে তা অনুমোদনের ব্যবস্থা নিবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তা অনুমোদন করার পরে নির্ধারিত কবুলিয়াত গ্রহণ করতঃ রেজিষ্ট্রি করে জমি হস্তান্তর করবেন। এসব জমি পনের বছরের মধ্যে কেউ বিক্রি বা হস্তান্তর করলে বা স্বামীর, স্ত্রীর বিবাঁহ বিচ্ছেদ ঘটলে বন্দোবস্তি বাতিল হয়ে তা খাস হয়ে যাবে।

চর জমি বন্দোবস্তি প্রক্রিয়া

কোন জমি নদী বা সমুদ্র গর্ভে সিকস্তি হয়ে গেলে জমির মালিক বা তার উত্তরাধিকারীগণের ঐ জমিতে সবরকমের মালিকানা বা স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়ে যাবে। নদীগর্ভ বা সমুদ্রগর্ভ থেকে কারও মালিকানাধীন জমির সংলগ্ন কোন চর সৃষ্টি হলে তা মালিকের জমির পরিবৃদ্ধি বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ কোন চর জেগে উঠলে তা নিরংকুশভাবে সরকারের উপর বর্তাবে এবং সরকার প্রচলিত নিয়মনীতি অনুযায়ী বন্দোবস্তি দেবে। নবসৃষ্ট চরের জমি যেহেতু সম্পূর্ণভাবে সরকারের জমি সেহেতু তা বেআইনী দখলদারমুক্ত রাখা এবং জমি চাষের উপযোগী হওয়া মাত্রই তা দিয়ারা জরীপ করিয়ে রেকর্ডভুক্ত করানোর জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর বরাবরে অনুরোধ পত্র প্রেরণের দায়িত্ব জেলা কালেক্টর পালন করবেন। চর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবেনা। তবে নতুন চরের জমির জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত কালেক্টর বা রাজস্ব অফিসার (অর্থাৎ সহকারী কমিশনার ভূমি) একসনা বন্দোবস্তি দিতে পারবেন।

এরূপ চরজমি একসনা ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তহশীলদার ইউনিয়ন এলাকার খাস জমির একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা উপজেলা ভূমি সংস্কার কমিটির নিয়মিত সভায় অনুমোদন করিয়ে নিয়ে বন্দোবস্ত দিতে পারবেন। এজন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদা কাগজে দরখাস্ত আহবান করবেন ও ব্যাপক প্রচার করবেন। ৮৫ বিধি অনুযায়ী একসনা বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের আবেদন পাওয়ার পরে আবেদনগুলি উপজেলা ভূমি সংস্কার কমিটি বিবেচনা

করে প্রয়োজনে সাক্ষাতকার গ্রহণ করে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে একসনা বন্দোবস্তি দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করবে। অতঃপর সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রত্যেক বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য পৃথক কেস সৃজন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন এবং ইউএনও উক্ত বন্দোবস্ত অনুমোদন করবেন। এই ইজারা নবায়ন যোগ্য নয় বিধায় বিরোধ বা মামলা এড়ানোর জন্য একই ব্যক্তিকে বার বার ইজারা না দেয়া বাঞ্ছনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে বার্ষিক ইজারা মূল্য একর প্রতি তিনশত টাকা।

এই ধরনের একসনা বন্দোবস্ত মূলত সাময়িক ভাবে জমি চাষ করার অনুমতি মাত্র। এর দ্বারা কোন মালিকানা, স্বত্বাধিকার বা দখল অধিকার সৃষ্টি হয় না। এমনকি ৬০ বৎসর কাল ব্যাপী জমিতে জবর দখল বা adverse possessional right এর মাধ্যমে মালিকানা প্রতিষ্ঠার যে বিধান রয়েছে তাও একসনা লিজ বা ডিসি আর মাধ্যমে দখলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর সংশোধিত ৮৫ ধারা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে বা পরে কোন সিকস্তি জমি, সিকস্তির ২০ বৎসরের মধ্যে পয়স্তি হলে সাবেক মালিক বা উত্তরাধীকারীগণকে উক্ত জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তবে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ প্রার্থীকে ভূমিহীনদের অগ্রাধীকার তালিকাভুক্ত হতে হবে।

অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত ও গুচ্ছ গ্রাম (আশ্রয়ন প্রকল্প) সৃজন

শহর বা পৌর এলাকার জমি কৃষি ও অকৃষি উভয় শ্রেণীর হতে পারে। অকৃষি জমি ১৮৮২ সালে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৯৪৯ সনের অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বিধান বলে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জমিদারী অধিগ্রহণের পূর্বে যে সকল অকৃষি প্রজাস্বত্ব বিদ্যমান ছিল কেবলমাত্র ঐ সকল ক্ষেত্রে অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে। শহর বা পৌর এলাকার বাইরে অকৃষি জমির ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। পৌর এলাকার অকৃষি জমি বন্দোবস্তির সময় লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো হলোঃ

(ক) বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে এরূপ স্বত্বভোগের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে যাতে তিনি ইমারত নির্মাণ জাতীয় মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত হন।

(খ) ইজারা মূল্য এমন ভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে পার্শ্ববর্তী অনুরূপ সুযোগ সুবিধাপূর্ণ এলাকাস্থ জমির মূল্যের সমান হয়।

অকৃষি জমির লিজ নির্ধারিত ফরমে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। লীজ দীর্ঘ মেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী হতে পারে। দুই ধরনের লিজের জন্য পৃথক ফরম ব্যবহার করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী লিজ সাধারণত ৩০ বৎসর মেয়াদী হবে যা ৯৯ বৎসর পর্যন্ত নবায়ন করা যাবে। স্বল্প মেয়াদী হোক বা দীর্ঘ মেয়াদী হোক লীজ গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই লীজকৃত জমি কারো নিকট হস্তান্তর বা সাবলীজ প্রদান করতে পারবেন না। আর স্বল্প মেয়াদী লীজ সাধারণত ৫ বৎসরের বেশী হবে না এবং লীজ গ্রহীতার লিজ নবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রচলিত নীতিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে। স্বল্প মেয়াদী লীজকৃত জমিতে কোন বাড়ী বা পাকা ইমারত নির্মাণ করা যাবে না। অন্যান্য ধরনের জমির ব্যবস্থাপনার ন্যায় এরূপ ক্ষেত্রেও তালিকা প্রকাশ, আপত্তি শ্রবণ ও নিষ্পত্তি, বন্দোবস্ত প্রদান, বন্দোবস্ত বাতিল, চূড়ান্ত আদেশ প্রদান, কবুলিয়াত ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে।

খাস জমিতে পুনর্বাসিত ভূমিহীনদের দখল বজায় রাখার প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিকূলতার মোকাবেলা, প্রাথমিক পুঁজি, উপকরণ সংগ্রহ ও সর্বোপরি মনোবল বৃদ্ধি ও দলগত চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে সমবায় সংগঠনের ভিত্তিতে বর্তমানে গুচ্ছগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্প সৃজন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এ ধরনের আদর্শ গ্রামের বা আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকার সদস্য হবেন তারা যাতে স্বাবলম্বী হয়ে স্ব স্ব পেশায় নিয়োজিত থেকে বেকারত্বের অভিশাপ মুক্ত একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন সে জন্যই মূলত গুচ্ছগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ ও সীমাতিরিক্ত জমি উদ্ধার

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ২০(২) এবং ৯০ ধারার বিধান মোতাবেক কোন ব্যক্তি ৩৭৫ বিঘার বেশী জমির মালিকানা অর্জন করতে পারবে না। বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিং লিমিটেশন অর্ডার ১৯৭২ (অর্থাৎ পিও - ৯৮/১৯৭২) বলে এই সীমারেখা ১০০ বিঘায় কমিয়ে আনা হয়। আর ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারী করে এই উর্ধ্বসীমা ৬০ বিঘায় নির্ধারণ করা হয়। তবে এই অধ্যাদেশ কার্যকরী হওয়ার আগে যারা ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির

মালিক ছিলেন তারা ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি রাখতে পারবেন। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি সরকারের সম্পত্তি হবে। কোন পরিবার বা সংস্থা এই তারিখের পরে ১০০ বিঘার বেশী জমি ক্রয়, দান, উত্তরাধিকার বা অন্য কোন সূত্রে অর্জন করতে পারবে না। ১০০ বিঘার ঊর্ধ্বসীমা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তে শিথিল করা যেতে পারে ঃ

(ক) সমবায় সমিতির সদস্যবর্গ যদি তাদের জমির মালিকানা সমিতির অনুকূলে হস্তান্তর করে নিজেরা চাষাবাদ করেন।

(খ) চা, কফি, রাবার বা অন্য কোন ফলের বাগানের জন্য ব্যবহৃত জমি।

(গ) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের জমি।

(ঘ) অন্য কোন কাজের জন্য জনস্বার্থে সরকার প্রয়োজন মনে করেন এরূপ জমি।

ওয়াকফ, দেবোত্তর বা ট্রাষ্টের মালিকানাধীন জমির সম্পূর্ণ আয় ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে ব্যবহৃত হলে এরূপ জমি ঊর্ধ্বসীমার আওতার বাহিরে রাখা যাবে । যাদের জমি ১০০ বিঘার, ঊর্ধ্বে তাদের সীমাতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট সমর্পণ করার জন্য রাজস্ব অফিসার জমির মালিককে নির্দেশ দিবেন এবং প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করে সমর্পণযোগ্য জমি গ্রহণের আদেশ দিবেন। এ আদেশের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল করা যাবে। এই আইন বলবৎ হওয়ার পরে কোন পরিবার বা সংস্থা ১০০ বিঘার বেশী জমি উত্তরাধিকারী সূত্র ব্যতীত অর্জন করলে বা জমির বিবরণী দাখিলের পরে অর্জন করলে সীমাতিরিক্ত এই জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত/সমর্পিত হবে। এই সীমাতিরিক্ত জমি নির্ধারণ করে তার দখল গ্রহণ করার জন্য কালেক্টরগণ সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

ভূমি সংস্কার আইন ও বর্গাদার

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বর্গদার ও ভূমি মালিক সম্পর্ক সুসংহত করার লক্ষ্যে ভূমি মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং কৃষি জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ নামে একটি অধ্যাদেশ জারী হয়। এই আইন পরিপন্থি কোন বিধান অন্য আইনে থাকলেও এই আইনের বিধানই কার্যকরী হবে। আর এই আইন কার্যকারী হওয়ার পরে কোন মালিক/পরিবার ৬০ বিঘার

বেশী জমির মালিকানা কোন ভাবেই অর্জন করতে পারবেনা । এই ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি অর্জন করলে তা সরকার ন্যস্ত হবে। কেবল মাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সীমাতিরিক্ত জমির জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

কোন ব্যক্তি নিজের ভোগদখল তথা ব্যবহারের জন্য অন্যের নামে কোন সংস্থার সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবে না। যে ব্যক্তির নামে সম্পত্তি কেনা হবে তিনিই তার প্রকৃত মালিক বলে গণ্য হবেন। কোন জমি বেনামীতে কেনা হয়েছে বা ক্রেতা অন্যের সুবিধার জন্য জমি কিনেছেন এমর্মে আদালতে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে না।

গ্রামাঞ্চলে কোন ব্যক্তি তার মালিকানাধীন জমিতে বসবাস করলে তার বসত ভিটার জমি নিলাম বা অন্য কোন প্রকারে দায়বদ্ধ বহির্ভূত বলে গণ্য হবে এবং আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের আইনানুগ কার্যক্রমের এক্তিয়ার বহির্ভূত থাকবে। বসবাসকারী ব্যক্তিকে বাস্তুভিটা হতে কোন ক্রমেই উচ্ছেদ করা যাবে না। তবে অন্য কোন আইনের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ভূমি সংস্কার বিধিমালা ১৯৮৪ জারীর পরে নির্ধারিত ছকে ও মূল্যমানের ষ্ট্যাম্পে তিন কপি বর্গাচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত কোন মালিক তার জমি অন্যের নিকট বর্গাচাষের জন্য প্রদান করতে পারবেন না বা কোন বর্গাদার অন্যের জমি বর্গাচাষের জন্য গ্রহণ করতে পারবে না। বর্গাচুক্তি ৫ বছর মেয়াদী হবে। উক্ত চুক্তিনামার একটি কপি বর্গাদারের, এককপি জমির মালিকের এবং একটি কপি নির্ধারিত রাজস্ব অফিসারের নিকট সংরক্ষণ করতে হবে। বর্গাচুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোন বর্গাদারের মৃত্যু হলে উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীনে বর্গাচুক্তি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত মৃত বর্গাদার পরিবারের জীবিত সদস্যগণ বর্গাজমি চাষ অব্যাহত রাখতে পারবেন। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত কারণে প্রদত্ত আদেশ ব্যতীত কোন মালিক বর্গাচুক্তি বাতিল করার অধিকারী হবেন নাঃ

(ক) বর্গাদার যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে বর্গাজমি চাষ করতে ব্যর্থ হলে;

(খ) কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে বর্গাদার সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত বর্গা জমির অনুরূপ জমিতে গড়ে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, সেই পরিমাণ শস্য উৎপাদনে ব্যর্থ হলে;

(গ) বর্গাদার বর্গাজমি কৃষি কাজ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে;

(ঘ) বর্গাদার এই অধ্যাদেশের কোন বিধান বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ লংঘন করলে;

(ঙ) বর্গাদার চাষের অধিকার সমর্পণ করলে বা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে;

(চ) বর্গাদার বর্গাজমি স্বীয় চাষাধীন না রাখলে এবং;

(ছ) মালিক কর্তৃক বর্গাজমি প্রকৃতই ব্যক্তিগত চাষাধীনে আনার প্রয়োজন হলে।

কোন বর্গাদার ১৫ বিঘার বেশী জমি চাষ করতে পারবেন না। বর্গাচুক্তি, খায়-খালসী বন্ধক বা ক্ষেত মজুর হিসাবে ব্যবহার ব্যতীত কেউ অন্যের কোন কৃষি জমি চাষাবাদ করতে পারবেন না। বর্গা জমির ফসল বিভাজন, বর্গা প্রদান, বর্গাচুক্তি বাতিল বা ফসল মাড়ানোর উদ্দেশ্যে ফসল তোলার স্থান সম্পর্কিত বর্গাদার ও মালিকের মধ্যে যাবতীয় বিরোধ নির্ধারিত কর্তপক্ষ নিস্পত্তি করবেন। এই নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না বা কোন মামলা করা যাবে না।

জলমহল ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বর্তমানে ১০,১০৮ টি জলমহল আছে। এই জলমহল মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকেঃ (১) বদ্ধ জলমহল (২) উন্মুক্ত জলমহল।

(১) বদ্ধ জলমহলঃ যে জলমহলের চতুর্সীমা নির্দিষ্ট অর্থাৎ স্থলাবেষ্টিত এবং যাতে মৎসসমূহের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য বৎসরের নিদির্ষ্ট সময়ে মৎস ধরার উপযোগী। যেমন, হাওড়, বিল, ঝিল, হ্রদ, দিঘী, পুকুর ইত্যাদি।

(২) উন্মুক্ত জলমহলঃ যে সকল জলমহল স্থলাবেষ্টিত নয় এবং নিদির্ষ্ট সময়ের জন্য মৎস্যের পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৎস্য শিকার বন্ধ রাখা যায়না সেগুলোকে উন্মুক্ত জলমহল হিসেবে গণ্য করা হয়।

সাধারণতঃ নদী, খাল বা প্রবাহমান স্রোত ধারাকে উন্মুক্ত জলমহল বলা হয়।

২০ একর পর্যন্ত আয়তনের পুকুর বা বদ্ধ জলমহল ব্যবস্থপনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ জলমহল থেকে লব্ধ আয়ের শতকরা ১ ভাগ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রদান করা এবং অবশিষ্ট আয় উপজেলা পরিষদের জন্য রাখার বিধান করা হয়েছে। যেসব জলমহল মৎস ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত আছে সেগুলির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সেই মন্ত্রণালয়ের উপরই ন্যস্ত থাকবে। তাছাড়াও ১৪০টি জলমহল পরীক্ষাধীন ব্যবস্থাপনার আওতায় থাকবে। অনধিক তিন একর আয়তন বিশিষ্ট জলমহলসমূহ, যার ইজারা মূল্য ৫০০০.০০ টাকার কম, সেগুলি জনগণের প্রথাগত অধিকার হিসাবে স্নান করা, কাপড় কাঁচা, পাট পচানো, মাছ ধরা, সেচ ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ একর প্রতি নামমাত্র বার্ষিক পাঁচ টাকা হিসাবে "৭-ভূমি রাজস্ব জলমহল হতে আয়" খাতে জমা দিয়ে উক্ত জলমহল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করবে। আর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ ব্যবস্থাপনার তদারকী করবেন। এরূপ জলমহল বা তার কোন অংশের জমি কাকেও লীজ দেয়া যাবেন না। এরূপ জলাশয়/জলমহল খাস জমির রেজিষ্ট্রারের প্রথম অংশে অর্থাৎ জনসাধারণের ব্যবহার্য বন্দোবস্তি বহির্ভূত অংশে লিপিবন্ধ থাকবে এবং মালিকানা সরকার পক্ষে কালেক্টরের উপর ন্যস্ত থাকবে। এরূপ জলমহল বাদে ২০ একর পর্যন্ত সব ধরনের জলমহল যার ব্যবস্থাপনা উপজেলা পরিষদের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে তা ব্যতীত সব জলমহল নীতিমালা অনুযায়ী প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে ইজারা বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

হাট বাজার ব্যবস্থাপনা

হাট বাজার সমূহ যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন হাটবাজার সম্পূর্ণরূপে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানায় ন্যস্ত। জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাটবাজারসমূহ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন- ১৯৫০ এর ২০ ধারা মোতাবেক সরকারের মালিকানায় ন্যস্ত হয়েছে। আর জনসাধারণের দাবী অনুযায়ী তাদের সুবিধার্থে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি কালেক্টরের নিকট রেজিষ্ট্রি দলিল মূলে হস্তন্তর করে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে, সুনির্দিষ্টভাবে হাটবাজার অন্তর্ভুক্ত জমিতে স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার্থে কালেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত হাটবাজারসমূহ প্রথম হতেই সরকারের মালিকানায় চলে এসেছে। অর্থাৎ

হাটবাজারের মালিকানা সম্পূর্ণভাবেই সরকারের। কোন প্রতিষ্ঠিত হাটবাজারের সংলগ্ন এলাকায় হাটবাজার সম্প্রসারণের প্রয়োজনে সরকারের পক্ষে কালেক্টর উক্ত জমি অধিগ্রহণকরে হাটবাজার ভুক্ত করবেন এবং এরূপ সম্প্রসারিত হাটবাজার এলাকায় ব্যক্তিমালিক টোল আদায় বা কোন প্রকার অর্থ আদায় করতে পারবেন না। কালেক্টর এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তার এলাকাস্থ হাটবাজারের তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং সায়রাত মহল রেজিষ্টারে যথারীতি লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি হাটবাজার পেরিফেরি বা চৌহদ্দী সঠিকভাবে বর্ণনা করে তার পরিমাণ সম্বলিত একটি ম্যাপ সংরক্ষণ করবেন।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল এর ২২৮ বিধি মোতাবেক প্রতিটি উপজেলা/ পৌরসভা/পৌর কর্পোরেশনের নিজ নিজ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হাট বাজারের ইজারালব্ধ আয় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টনের লক্ষ্যে হাটবাজারসমূহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি নিদির্ষ্ট সময়ের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। নতুন হাটবাজার প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন হাটবাজার তুলে দেয়া সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব জেলা কালেক্টর ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। ২৩০ নং বিধির নির্দেশনা মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে হাটবাজার ইজারা দেয়া যাবে।

ফেরীঘাট ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২রা নভেম্বর ১৯৮৭ তারিখের স্মারক অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/পৌর কর্পোরেশন এর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত ফেরীঘাটসমূহ আয় নির্বিশেষে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যবস্থাপনার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। ফেরীর উঠানামার স্থান একই ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত হলে সেই ফেরী ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা করবে। যেসব ফেরীর উঠা বা নামার যে কোন একটি স্থান এক ইউনিয়নে এবং অপরস্থান অন্য একটি ইউনিয়নে অবস্থিত এরূপ ফেরীর ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের উপরে ন্যস্ত থাকবে। যেসব ফেরীর উঠা বা নামার যে কোন একটি স্থান পৌরসভা/পৌর কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত এরূপ ফেরীর ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত থাকবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/জেলা প্রশাসক একসনা ভিত্তিতে প্রকাশ্য নীলামের সর্বোচ্চ ডাককারীকে ইজারা প্রদান করবেন । ফেরী ঘাটে যাত্রীদের চলাচলের জন্য উপযুক্ত নৌযান সরবরাহ ও

উঠানামার জন্য প্রয়াজনীয় ঘাট ইজারাদার বা পাটনী নিজ ব্যয়ে নির্মাণ ও সংরক্ষণ করবেন। ইজারা মূল্যের ১% প্রিমিয়াম রূপে ভূমি মন্ত্রণালয়ের "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে জমা দিয়ে চালানের কপি জেলা প্রশাসককে দিতে হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট পরিষদ/পৌরসভার সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে।

রাস্তা সংলগ্ন জমি, কাছারী প্রাঙ্গন

সড়ক ও জনপথ বিভাগ অথবা জেলা পরিষদ রাস্তা সংলগ্ন জমির ব্যবহার সম্পর্কে জনপথ আইনের (Highways /Act -1925) অধীনে প্রণীত বিধিমালা প্রযোজ্য হবে। এরূপ রাস্তা সংলগ্ন জমি লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে কালেক্টর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ ও জেলা পরিষদের অফিসারগণকে সহায়তা দিবেন। সড়ক সংলগ্ন জমিসমূহ সাধারণতঃ কোন লীজ দেয়া যাবে না। এরূপ জমি ব্যবস্থাপনার জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগ নিজেই ব্যবস্থা নিতে পারে, কালেক্টরের উপরে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে অথবা ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পণ করতে পারে। কালেক্টর এরূপ জমি লীজ দেয়ার ক্ষেত্রে সওজ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে নেবেন। আর ভূমি মন্ত্রণালয় খাসভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের নীতিমালানুযায়ী এরূপ জমি বন্দোবস্ত প্রদান করবে। পাথর বালি, চুনাপাথর, কঠিনশীলা জাতীয় খনিজ সম্পদ আহরণ ও অপসারণের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) পাথর, বালু ইত্যাদি আহরণ ও সংগ্রহ করার জন্য উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন অফিসারের নিকট আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) আবেদনে প্রতিটি শ্রেণীর দ্রব্যের চাহিদার আনুমানিক পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

(গ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী বা উর্ধ্বতন অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত কালেকটর কর্তৃক অনুমোদিত স্থান হতে পাথর, বালু ইত্যাদি আহরণ ও অপসারণ করা যাবে। আহরণের অনুমতিপত্র সরকার নির্ধারিত ফরমে প্রদান করতে হবে।

(ঘ)প্রচলিত বাজার মূল্যে ও স্থানীয় অবস্থা দৃষ্টে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত ও বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদিত হারে ইজারা মূল্য আদায় করতে হবে।

(ঙ) ন্যূনতম সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর পদ মর্যাদা সম্পন্ন অফিসারের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্তৃক আহরিত পাথর, বালু ইত্যাদির পরিমাণ মাপ ও যাচাই করার উদ্দেশ্যে তা সুবিধা-জনক স্থানে রাখতে হবে

অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের অধীনে প্রণীত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি ১৯৬৫এর ১৮২ বিধি মোতাবেক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এলাকার যেসব নাগরিক ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে ভারতে অবস্থানরত ছিলেন বা ঐ তারিখ হতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ (জারুরী অবস্থা প্রত্যাহারের তারিখ) পর্যন্ত ভারতে গমন করেছেন তাদের যাবতীয় সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বলে গণ্য হয় এবং এর ব্যবস্থানা উপতত্ত্বাবধায়কের উপরে ন্যস্ত করা হয়। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করার পরে The Enemy Property (continuannce of Emergency Provision) Ordinance,1969 এর বিধান অনুযায়ী শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত বিধানসমূহ বলবৎ রাখা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যাদেশ বাতিল করে The Enemy Property (continuannce of Emergency Provisions (Repeal) Act, 1974 জারী করা হয়। এই আইন অনুযায়ী যেসব শত্রু সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়ক/উপ-তত্ত্বাবধায়কের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল সেসব সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে সরকারে বর্তায়। The Vested & Non Resident Property (Administration) Act 1974 এর বিধান মোতাবেক যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক নন বা নাগরিকত্ব হারিয়েছেন অথবা বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন তার সম্পত্তি অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে সরকারে বর্তেছে। সেসব সম্পত্তির দখল সরকার গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক এসব জমি অবৈধ দখলদারমুক্ত করার জন্য উচ্ছেদ প্রক্রিয়াও অনুসরণ করবেন। জেলা প্রশাসকের এ ক্ষমতা ইউএনও প্রয়োগ করতে পারবেন। কোন অর্পিত সম্পত্তি পুনঃঅবৈধভাবে বেদখল হয়ে গেলে জেলা প্রশাসক বা তার ক্ষমতা প্রাপ্ত অফিসার তাকে উচ্ছেদ করে উক্ত সম্পত্তি সরকারের দখলে আনবেন। সকল অর্পিত সম্পত্তি (জমি/ইমারত) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার অর্পিত সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া দিতে পারবেন এবং উক্ত সম্পত্তির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বপ্রকার পদক্ষেপ নিবেন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ইজারার শর্ত ভঙ্গের কারণে নব্য ইজারা/ভাড়ার অর্থ প্রদানে

ব্যর্থ হলে ইউএনও লীজ বাতিল করবেন এবং অর্পিত সম্পত্তির যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। ইজারা প্রদানের সুবিধার্থে অর্পিত সম্পত্তি আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ (ক) কৃষি জমি, (খ) পতিত অকৃষি জমি, (গ) গ্রামাঞ্চলে কাঁচা বা পাকা বাড়ী/ঘর, (ঘ) শহারাঞ্চলে কাঁচা বা পাকা বাড়ী/ঘর, (ঙ) দোকান/ গুদাম ঘর ইত্যাদি, (চ) ফলের বাগান, (ছ) পুকুর, দীঘি, বিল, জলাশয় এবং (জ) অর্পিত সম্পত্তিতে অবস্থিত অস্থাবর সম্পত্তি বা যাহা ভূমির সাথে গ্রথিত। সকল কৃষি জমি একসনা ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে লীজ দেয়া যাবেঃ

(ক) লীজ বলবত হওয়ার আগেই সমুদয় লীজ অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে হবে।

(খ) লীজযুক্ত জমির শ্রেণীগত বা ভৌগলিক কোন পরিবর্তন করা যাবেনা।

(গ) কোন রূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে যে কোন সময় লীজ বাতিল করা যাবে।

ঘ) ইজারাদার লীজ সম্পত্তিতে কোনরূপ দায় সৃষ্টি করতে পারবেনা সাব-লীজ দিতে পারবেনা।

সরকার প্রচলিত নীতি নির্দেশার আলোকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রামের উন্নয়ন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত অকৃষি জমি আবাসিক উদ্দেশ্যে প্রকৃত বিবেচনা যোগ্য ব্যক্তির নিকট অনূর্ধ্ব ১০ কাঠা জমি দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দেয়া যাবে। আর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ৫ কাঠা জমি সরকার আরোপিত শর্তে লীজ দেয়া যাবে। হাট বাজারের জমি সর্বোচ্চ ডাককারীকে অনূর্ধ্ব ৫ কাঠা পর্যন্ত লীজ দেয়া যাবে। কাঁচা/ পাকা বাড়ী ঘর, দোকান, গুদাম ইত্যাদি অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের প্রকাশ্য নীলামে সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট বাৎসরিক ভিত্তিতে লীজ দেয়ার নিয়ম অব্যাহত থাকবে। পুকুর, দীঘি বা ফলের বাগান ইত্যাদি তিন বছর মেয়াদে প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীকে ইজারা দেয়া যাবে। অর্থাৎ সকল অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ডাককারীকে দেয়া যাবে। এতে প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যবান দ্রব্যাদি বা বই জাতীয় যাদুঘর ও জাতীয় গ্রন্থাগারে সমর্পণ করা হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার লীজ প্রদানের লক্ষ্যে নীলাম পরিচালনা করবেন।

১৯৬৭-৬৮ সালে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে সরকারী নির্দেশে প্রত্যেক জেলায় অর্পিত সম্পত্তির (তৎকালীন শত্রু সম্পত্তি) একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ প্রণয়ন করেছিলেন। এই তালিকার ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার সম্পত্তির দখলকারীকে নোটিশ ও শুনানীর সুযোগ প্রদান করে অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা ও দখল নিতেন । অর্পিত সম্পত্তি ভুলভাবে তালিকাভুক্তি বা অন্য কোন সংগত কারণে কোন সম্পত্তি প্রকৃত অর্পিত সম্পত্তি নয়, এরূপ প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট মালিক/দখলকারের আবেদনের ভিত্তিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) যথাযথ শুনানী প্রদান ও কাগজপত্র পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে তিনি ঐ সম্পত্তি অবমুক্ত করার সুপারিশ সহকারেঃ (ক) অনধিক ৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমি অবমুক্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং (খ) অকৃষি জমি ও ৫বিঘার ঊর্ধ্বে জমির ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিকট নথি পাঠাবেন। বিভাগীয় কমিশনার/ভূমি সংস্কার বোর্ড প্রয়োজনে শুনানী গ্রহণ করে চূড়ান্ত আদেশ দিবেন ও জেলা প্রশাসক ঐ আদেশের ভিত্তিতে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা সংশোধন করবেন। অর্পিত সম্পত্তি হতে যাবতীয় আয় সুনির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে। অর্পিত ঘরবাড়ী, ইমারত ইত্যাদি মেরামত/সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) প্রয়োজন মনে করলে প্রাপ্ত আয়ের ১৬% ব্যয় করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশ মোতাবেক ২১/৬/৮৪ তারিখ হতে নতুন ভাবে অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণা ও দখল গ্রহণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। নতুন ভাবে আর কোন সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে ঘোষণা দেয়া যাবে না। তবে যে সব সম্পত্তি সরকারী আওতাধীন ও ব্যবস্থাপনায় আছে সে সব সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সরকারীভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

বিনিময় সম্পত্তি নিয়মিতকরণ

বাংলাদেশ থেকে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত থেকে বিতাড়িত বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি বিনিময় কেইসসমূহের মধ্যে ৬/৯/১৯৬৫ ইং তারিখের আগে (অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ) জারীর পূর্বে বিনময়কৃত সম্পত্তিই নিয়মিত করা যাবে। এরূপ সম্পত্তিকে আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ (ক) ১০/১০/১৯৬৪ ইং তারিখের পূর্বে বিনিময়কৃত সম্পত্তি যা পরবর্তীতে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। (খ) ১০/১০/১৯৬৪ ইং থেকে ৫/৬/১৯৬৫ ইং তারিখের মধ্যে যেসব সম্পত্তি বিনিময় করা হয়েছে।

১০/১০/ ১৯৬৪ ইং এর পূর্বে বিনিময়কৃত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে বিধায় জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট ভারত-প্রত্যাগত মুসলমান বিনিময়কারী দখলকারগণ হতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রকৃত বিনিময় বলে সন্তুষ্ট হয়ে বিনিময় নিয়মিতকরণের আদেশ দিবেন এবং এই আদেশের ভিত্তিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিনিময়কারীর অনুকূলে হস্তান্তর দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করে দিবেন। এ জন্য কোন সালামী মূল্য দিতে হবে না বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনেরও প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ১০/১০/১৯৬৪ হতে ৫/৯/১৯৬৫ ইং পর্যন্ত সময়ে বিনিময়কৃত সম্পত্তি The East Pakistan Disturbed Persons (Rehabilitation) Ordinance-1964) এর ৬ক ধারা মোতাবেক সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে এরূপ সম্পত্তির বিনিময় নিয়মিতকরণের আবেদন পাওয়ার পরে জেলা প্রশাসক তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রকৃতভাবে বিনিময় হয়েছে বলে সন্তুষ্ট হলে তিনি প্রথমে উক্ত জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে আদেশ দিবেন এবং একইসঙ্গে বিনিময়কারীর সাথে সালামী ছাড়াই বন্দোবস্তির আদেশ দিবেন। প্রকৃত পক্ষে বিনিময় হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য জেলা প্রশাসক নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করবেনঃ

(ক) আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) থাকুক বা না থাকুক দলিলের যথার্থতা ;

(খ) বিনিময় আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে ভারত প্রত্যাবর্তনকারী বা বাস্তুত্যাগী কিনা;

(গ) বিনিময় দাবীকৃত সম্পত্তি প্রকৃত পক্ষে তথাকথিত দেশত্যাগী হিন্দুর মালিকানাধীন ছিল কিনা;

(ঘ) ভারতীয় সম্পত্তি বিনিময় সংক্রান্ত কোন রেজেষ্ট্রিকৃত দলিল না থাকলে জেলা প্রশাসক বিনিময় প্রমাণের জন্য উপযুক্ত কাগজপত্র তলব করতে পারেন;

নামজারী জমা খারিজ

১৯৫৬ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করে ১৯৬২ পর্যন্ত সময়কালে একই সাথে সকল জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপ করে জমিদারগণকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের তালিকা প্রণয়ন ও ভূমি মালিকগণকে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ ও রেকর্ড সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ জরিপের মাধ্যমে ভূমি মালিকের নাম ও তার জমির বিবরণাদি সম্বলিত একটি কপি তহশীল (ইউনিয়ন ভূমি) অফিসে এবং অন্যটি সার্কেল পরিদর্শক

(উপজেলা রাজস্ব) অফিসে এবং অন্য একটি কপি জেলা রেকর্ড রুমে সংরক্ষণের জন্য দেয়া হয়। এটাই এস,এ খতিয়ান হিসাবে পরিচিত। প্রয়োজনে কোন জেলায় বা এলাকায় পুনরায় জরিপ করে পূর্ববর্তী জরিপে প্রণীত মৌজা নক্সা এবং খতিয়ান সংশোধন ও হালকরণের জন্য জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৪ ধারায় বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের ১৪৪ ধারা এবং সার্ভে আইন ১৮৭৫ এর ৩ ধারা অনুসারে সরকার কোন জেলা বা এলাকায় জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়নের জন্য প্রজ্ঞাপন জারী করলে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সংশোধনী বা পুরা দস্তুর ক্যাডাষ্ট্রল জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এইরূপ জরিপে প্রণীত রেকর্ড বা খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে এমর্মে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী হওয়ার পরে এ নতুন খতিয়ান কার্যকর হয় এবং সাবেক জরিপে প্রণীত খতিয়ান তার কার্যকরতা হারায়।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এ জরিপ রেকর্ড সংশোধন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় বলে দু'জরিপের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তরাধিকার, দান, বিক্রি ইত্যাদি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার ফলে ভূমি মালিকানার পরিবর্তন জরিপে প্রণীত খতিয়ানে প্রতিফলিত করার জন্য অর্থাৎ খতিয়ান হালকরণের জন্য জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারায় কালেক্টরকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। জমা খারিজ, একত্রিকরণ ও নামজারীর মাধ্যমে কালেক্টর অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে খতিয়ান সংশোধন ও হালকরণ করে থাকেন। উক্ত ধারা মোতাবেক কালেক্টর করণিক ভ্রান্তি সংশোধনসহ নিম্নোক্ত কারণে খতিয়ান সংশোধন সহকরে হালকরণকৃত খতিয়ান সংরক্ষণ করবেনঃ

(ক) উত্তরাধিকার বা হস্তান্তরমূলে মালিকানা পরিবর্তন;
(খ) জমা একত্রীকরণ ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় মালিকানা পরিবর্তন ;
(গ) সরকার কর্তৃক অন্য খাসজমি বন্দোবস্তি প্রদান;
(ঘ) পরিত্যক্ত বা পয়স্তিজনিত কারণে ভূমি কর মওকুফ;

ভূমি মালিকের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারগণের নামে নামজারী করা হয়। এতে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য জরুরীভাবে তহশীলদার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেন সেজন্য সতর্কদৃষ্টি রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আবার ভূমি হস্তান্তর ও রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী জমি হস্তান্তর হলে তার ভিত্তিতে বেশ

কিছু সর্তকতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ সাপেক্ষে জমির নামজারী ও জমাখারিজ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা উচিৎ ।

জমাবিভক্তিঃ নামজারী করার সময় কোন বৃহৎ প্লট বা দাগ বিভক্তির প্রয়োজন দেখা দিলে মৌজার হাল নক্সা হতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সূচক একটি ট্রেসম্যাপ নামজারী নথির সাথে প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করতে হবে। নতুন প্লটের জন্য একটি পৃথক দাগ নম্বর দিতে হবে এবং তা মৌজার দাগসূচীর ক্রমানুসারে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ - যদি মূল দাগ নম্বর ৭২ হয় এবং মৌজায় মোট ৩৭৫ টি প্লটের জমি থাকে তবে নতুন দাগ নম্বর হবে ৭২/৩৭৬ । সহকারী কমিশনার (ভূমি) নামজারী আদেশ দেবার সাথে সাথে নতুন খতিয়ান সৃজন করবেন এবং ১,২, এবং ৯ নম্বর রেজিষ্টারে তা সংশোধনক্রমে লিপিবদ্ধ করেন। আর তিনি এ রেকর্ড 'খ' শ্রেণীভুক্ত হিসাবে সংরক্ষণ করবেন।

নাব্য নদীতে অনুপ্রবেশ

সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কালেক্টর সকল নৌ-পরিবহনযোগ্য নদী ও নদী প্রবাহের তত্ত্বাবধায়ক। নৌ-পরিবহনযোগ্য সকল নদী (অর্থাৎ নাব্য নদী), সংযোগ খাল প্রবাহসমূহের তলদেশ ও ফোরশোরসমূহের উপরে সরকারের নিরংকুশ ক্ষমতা আছে। নদী তীরবর্তী কোন ভূমি মালিকের নদীর তলদেশ বা ফোর শোরের উপরে কোন অধিকার নাই। যদি কেউ উক্ত জোয়ার রেখার নিম্নে কোন প্রকার অনুপ্রবেশ করেন বা জেটী, স্নান ঘাট ইত্যাদি এমন ভাবে নির্মাণ করেন যা নদীর উচ্চ জোয়ার রেখার নিম্ন পর্যন্ত প্রসারিত, তবে তিনি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত হবেন এবং কালেক্টর তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন। কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে দেওয়ানি আদালতের মাধ্যমে এরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বা সরকার প্রদত্ত ইজারা ব্যতীত নদীর তলদেশ বা তার ফোরশোরগুলোতে বালু, নুড়ী পাথর সংগ্রহ বা অপসারণ করতে দেয়া হবে না। সড়ক বা বাঁধ নির্মাণের বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত নদী তীরবর্তী জমিতে সরকারের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও অধিকার থাকবে।

রেজিষ্টার ও রিটার্নসমূহ

ভূমি ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত অফিসারগণকে রেজিষ্টার সংরক্ষণ ও নিয়মিত প্রতিবেদন বিবরণী (রিটার্ন) দাখিল করতে হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা কাজে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ রেজিষ্টারগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত রেজিষ্টারগুলি উল্লেখযোগ্যঃ

রেজিষ্টার -১ঃ জমাবন্দী রেজিষ্টার হিসাবে পরিচিত এই রেজিষ্টারে জমি মালিকের নাম, জমির পরিমাণ, জমির শ্রেণী ইত্যাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। সেটেলমেন্ট অপারেশন কালে প্রণীত খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরে বাঁধাই করে এই রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হয়। এ রেজিষ্টারের শেষের দিকে পরবর্তীতে বিভাজন ও নামজারীর জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সাদা পৃষ্ঠা সংযোজন করতে হয়। আর জরিপ পরবর্তী রেজিষ্টারে সাদা ফরম সংযোজন করতঃ সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজিষ্টারের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রত্যায়ন করে সীল ও স্বাক্ষর করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদেশ ব্যতীত এই রেজিষ্টারে কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না।

রেজিষ্টার-২ঃ এ রেজিষ্টার ভূমি মালিকানা বা তলববাকী রেজিষ্টার নামে পরিচিত। ভূমি মালিক কর্তৃক পরিশোধিত করের পরিমাণ ও দাখিলার নম্বর এবং মানি অর্ডার বা চালানোর মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকলে মানি অর্ডার বা চালানোর তারিখ এবং নম্বর এই রেজিষ্টারে যথাযোগ্য কলামে লিপিবদ্ধ করতে হয়। ম্যানুয়ালের ৩৬০ নং বিধিতে এই রেজিষ্টার লিপিবদ্ধ করার নিয়ম পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে।

রেজিষ্টার -৩ঃ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী (তহশীলদার) দৈনন্দিন কর, করের উপর প্রদেয় সুদ বা অন্য কোনরূপ আরোপিত কর, ফিস ইত্যাদি বাবদ যা আদায় করেন তা এই রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এই রেজিষ্টারে লিখিত আদায়ের বিবরণের সাথে ২ নম্বর রেজিষ্টারেও তা লিখতে হয়।

রেজিষ্টার-৪ঃ এ রেজিষ্টারটি একমাত্র ক্যাশ রেজিষ্টার হিসাবে বিবেচিত। এ রেজিষ্টারে প্রতিটি জমা ও খরচের বিবরণী লিখতে হয়। ৩ নং এবং ৪ নং রেজিষ্টারের বিভিন্ন আদায়কৃত অর্থের যে হিসাব লিখা হয় তদনুযায়ী আদায় এবং ট্রেজারীতে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ এ রেজিষ্টারের ৩ এবং ৮নং কলামে লিপিবদ্ধ করা হয়।

রেজিষ্টার-৫ঃ ট্রেজারী পাসবইটিই রেজিষ্টার -৫ হিসাবে পরিচিত।

রেজিষ্টার-৬ঃ বিভিন্ন ধরনের দাবী যেমন-বনজদ্রব্য, সামগ্রীর লীজ, ফেরীঘাট, জলমহল, হাট ইত্যাদির দাবী বা বাৎসরিক ইজারা দানের যে দাবী হয় তা এ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

রেজিষ্টার-৭ঃ রেজিষ্টারভুক্ত ভূমি মালিকগণ হতে প্রাপ্য কর ও সুদ ব্যতীত সরকারের অন্যান্য সবরকমের প্রাপ্যের জন্য এই রেজিষ্টার ব্যবহৃত হয়। ৩নং রেজিষ্টারের ন্যায় সবরকমের বিবিধ দাবী আদায়ের বিবরণ এতে লিখতে হয়।

রেজিষ্টার-৮ঃ এই রেজিষ্টার খাস জমির রেজিষ্টার হিসেবে পরিচিত। এই রেজিষ্টারের জন্য নির্ধারিত ফরম মোট ৪টি অংশে সংরক্ষণ করতে হয়।

(১) এই অংশে সর্বসাধারণের ব্যবহারের অধিকার সম্বলিত বিবরণ থাকবে অর্থাৎ রাস্তা, হালট, পানীয় জলের পুকুর, বাঁধ, কূপ ইত্যাদি যা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য অধিকার থাকার কারণে লিজ দেয়া যায় না।

(২) যে সকল খাস জমি চাষ যোগ্য জমি বা সায়রাত হিসাবে বন্দোবস্তি দেয়ার যোগ্য তার বিবরণ এই অংশে থাকবে।

(৩) সরকার যে সব জমি ক্রয় করেছেন অথবা আইনানুগ ভাবে পুনঃগ্রহণ করেছেন বা পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে সরকারের মালিকানাধীন হয়েছে তার বিবরণ এ অংশে থাকবে।

(৪) নদী সিকস্তি খাস জমির বিবরণ এ অংশে থাকবে।

সকল শ্রেণীর খাস জমি পতিত অবস্থায় বৎসরে কয়েকবার নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী পরিদর্শন করবেন এবং মন্তব্য ৮ নম্বর রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। অনুরূপভাবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিয়মিতভাবে এরূপ জমি পরিদর্শন করবেন। নদী সিকস্তি জমি পয়স্তি হয়েছে কিনা এবং নতুন চরের জমি চাষ যোগ্য হয়েছে কিনা তা পরিদর্শন করবেন।

রেজিষ্টার-৯ঃ এই রেজিষ্টার নাম জারীর রেজিষ্টার হিসেবে অভিহিত যা দুই অংশে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রথম অংশ উত্তরাধিকার বা জমা খারিজের আবেদনের প্রেক্ষিতে নাম জারীর জন্য ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় অংশ বিক্রয়, দান ইত্যাদি জনিত কারণে সাবরেজিষ্টারের অফিস অথবা আদালত হতে প্রাপ্ত নোটিশ বা আদেশের ভিত্তিতে নাম জারীর জন্য ব্যবহৃত হবে।

রেজিষ্টার-১০ঃ এক বৎসরের বেশী মেয়াদী লিজের ক্ষেত্রে এ রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। মেয়াদী লিজের ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই পুনঃ লিজ নিশ্চিত করাই এই রেজিষ্টার সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য।

রেজিষ্টার-১২ঃ জমি বন্দোবস্তির জন্য প্রস্তাবসমূহ এই রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। সব শ্রেণীর খাস জমি, সরকার কর্তৃক ক্রীত জমি বা পরিত্যক্ত জমির জন্য এই রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

রেজিষ্টার-১৩ঃ যে সকল দরখাস্ত বা আবেদনের জন্য কোন রেজিষ্টার নির্দিষ্ট করা হয়নি সেসব আবেদন বিবেচনার জন্য এই রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

রেজিষ্টার-১৭ঃ জেলা কালেক্টরেট অফিসের সংরক্ষিত এই রেজিষ্টারটি চালান রেজিষ্টার হিসেবে অভিহিত । প্রতিটি উপজেলার জন্য বা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য পৃথক ভলিউম সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

রেজিষ্টার-২৬ঃ প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে ঊর্ধ্বতন তদারকী অফিসারগণ কর্তৃক অফিস পরিদর্শনান্তে পরিদর্শন মন্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য এই রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হয়।

রেজিষ্টার-৩২ঃ ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা উপজেলা ভূমি অফিসে আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত কর্মচারীগণের জামানত হিসেবে সংরক্ষণের জন্য এই রেজিষ্টার ব্যবহার করতে হয়।

রিটার্ন বা নিয়মিত বিবরণীঃ রিটার্ন-১ সব প্রজাস্বত্ব বা প্রজাবিলি ভূমির বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবী-আদায় ও বকেয়া সংক্রান্ত ১২ মাসের প্রতিবেদন প্রতিবছরের ১৫ই মে তারিখের মধ্যে কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করতে হয়। কালেক্টর এই কপি কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার বোর্ডে পাঠাবেন।

রিটার্ন-২ঃ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের অগ্রগতি সম্বলিত প্রতিবেদন তহশীলদার প্রতি মাসে প্রণয়ন করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও কালেক্টরের নিকট পাঠাবেন।

রিটার্ন-৩ঃ বৎসর শেষ হওয়া মাত্র কর খেলাপকারীদের (যিনি ৩০শে চৈত্রের মধ্যে কর শোধ করেননি তিনি কর খেলাপী) বিবরণ সম্বলিত এই রিটার্ন ভূমি সহকারী প্রণয়ন করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট প্রেরণ করবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী প্রাপ্য আদায় আইন (সার্টিফিকেট) মামলা করতে হবে তার নির্দেশ দিবেন ।

ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য P.D.R act-1913 এর আওতায় সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়া তখনই প্রয়োগ করা উচিৎ যখন সাধারণভাবে ভূমি মালিকগণ কর প্রদানের সামর্থ রাখেন। কারণ কর আদায় কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এবং জনমনে কর পরিশোধ না করার অপচেষ্টা প্রতিরোধের জন্য মূলতঃ এই মামলার বিধান রাখা হয়েছে। প্রসংগত একটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিৎ যে, লাল নোটিশ জারী না করে কোন মামলা রজু করা ঠিক নয়।

কর্মচারীর জামানত

উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কর্মরত হিসাব রক্ষক, নাজির-কাম-ক্যাশিয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী, সব কর্মচারীগণের প্রত্যেকের ৫০০০/- টাকা হারে নগদ জামানত রাখার বিধান করা হয়েছে। এই জামানত কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিতে পারেন। কর্মচারী তিনজন জামিনদার সহকারে মোট ১৫,০০০/- টাকার বন্ড প্রদান করবেন। এ বন্ডসমূহ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরের হেফাজতে রাখতে হবে।

হিসাব প্রক্রিয়া

ভূমি উন্নয়ন কর, হাটের প্রাপ্য, লীজ অথবা যে কোন রকমের সরকারী প্রাপ্য পরিশোধের স্বীকৃতি হিসাবে আদায়কারী রশিদ প্রদান করবেন। আদায়ের পরে প্রত্যেক আদায় রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ভূমি কর বা অন্য যে কোন আদায় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সামনে দেয়ালে প্রকাশ্যভাবে নীচের কথাগুলি লিখে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে ঃ

> *"প্রত্যেক ব্যক্তি/ভূমি মালিক ভূমি উন্নয়ন কর বা উহার উপরে সুদ বা অন্য কোন সরকারী প্রাপ্য পরিশোধ কালে ইউনিয়ন ভূমি সহকারীর নিকট হইতে অবশ্যই রশিদ গ্রহণ করিবেন। আবওয়াব অথবা অন্য কোন আইন বর্হিভূত অর্থ প্রদান ও গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ"।*

মানি অর্ডারযোগ্য ভূমি উন্নয়ন কর পাওয়া গেলে পৃথক রশিদ না দিয়ে মানি অর্ডার নম্বর এবং তারিখ দিয়ে রেজিষ্টারে সেটি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট চালান কুপনটি গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যক্তি/সংস্থার মালিকানাধীন জমির উপরে সরকার নির্দেশিত হারে সুদ নির্ধারণ করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রস্তুতের তারিখ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সুদ ধার্য করার নিয়মাবলী ১৯৫৫ সালের সার্টিফিকেট ম্যানুয়ালের ২৭(২) নং বিধির নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। যথাঃ

(ক) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ হিসাব করতে হবে।

(খ) ১২/- টাকার নিম্নে কোন দাবীর সুদ হিসাব করা হবে না।

(গ) সার্টিফিকেট প্রস্তুত করার তারিখ হতে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সময় তিন মাসের কম হলে কোন সুদ আরোপ করা হবে না। তবে তিন মাসের বেশী হলে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য সুদ আরোপ করা হবে।

(ঘ) তিন মাসের অতিরিক্ত কোন মাসের ভগ্নাংশ ও ১২/- টাকার অতিরিক্ত কোন টাকার ভগ্নাংশ অগ্রাহ্য হবে।

(ঙ)কোন পরওয়ানার নোটিশে বা বিক্রয় পরওয়ানায় সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেটের মূল দাবী, প্রসেস ফি এবং আরোপিত সুদের হার যোগ করে মোট দাবী দেখাবেন।

সরকারের অনুমোদন ক্রমে কালেক্টর কোন এলাকায় সমগ্র এলাকা বা বিশেষ ক্ষেত্রে ফসলহানির কারণে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট কেসের সুদ মওকুপ করতে পারবেন। আদয়কৃত অর্থ ভূমি সহকারী আদায়ের দিনই বা পরদিন ট্রেজারীতে ট্রেজারী চালানযোগে পাসবই সহজমা প্রদান করবেন। ট্রেজারী চালান তিন কপিতে লিখতে হবে।

পরিদর্শন ও তদারকি

উর্ধ্বতন অফিসার কর্তৃক অর্ধ্বঃস্তন অফিসসমূহ পরিদর্শনের ফলে অফিসের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অধিকতর সহজ ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। এজন্য কালেক্টর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও ডেপুটি কালেক্টরগণের জন্য প্রতিমাসে সফরের দিবস সংখ্যা বিভিন্ন সার্কুলার জারী করে নির্ধারণ করা হয়েছে। অধস্তন অফিসারগণ নিয়মিত সফর করেছেন কিনা তা ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় কালেক্টর পর্যালোচনা করবেন। আর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাসের ১৫দিন সফরে

থেকে তাঁর অধীনস্থ সকল ভূমি অফিস পরির্দশন করবেন। এসময় রেজিষ্টার ২ হতে ৮ পর্যন্ত সব রেজিষ্টারের সাথে কর ও ফিস আদায়ের রসিদের মূল কপি তুলনামূলক নিরীক্ষা করে আদায়ের ১০০% তাকে নিরীক্ষা করতে হবে। তিনি পরিদর্শনকালে অধস্তন কর্মচারীদের আদায়কৃত অর্থ নিয়মিতভাবে জমা প্রদান প্রক্রিয়া, খাস জমির ১০% সরজমিনে পরিদর্শন, নামজারী কেসসমূহ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ যথাযথভাবে এবং নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হয় কিনা, তা পরির্দশনকালে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন। পরির্দশন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষকে সামনে রেখে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিদর্শন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন সেজন্য ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালে বর্ণিত প্রশ্নমালা অনুসরণ করার বিধান রাখা হয়েছে।

উপসংহার

উপরের আলোচনার মাধ্যমে একথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া। ভূমি ব্যবস্থাপনা যত সুচারুরূপে ও সুন্দররূপে সম্পন্ন করা যাবে, সমাজের মানুষ ততই স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দের সাথে জীবন যাপন করতে পারবে। প্রায়ই ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বলা হয় যে এটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া । ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইনের অস্পষ্টতা এবং পর্যাপ্ত ও যুগোপযোগী আইনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন বা বিধি-বিধানের স্পষ্ট ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একথা অনস্বীকার্য যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো উপযোগী আইন বা বিধানসমূহ হালকরণ (Uptodate) হওয়া দরকার। কিন্তু এর চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হলো, ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিস্বার্থভাবে ও একাগ্রতার সাথে এমন বিধি-বিধান প্রণয়নে অগ্রনী ভূমিকা পালনে ব্রতী হওয়া। কিন্তু হতশাব্যঞ্জক হলেও সত্য যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আইন ও বিধি-বিধান প্রায়ই যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়না বা সেগুলি যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হয় না। এজন্য কাউকে সুস্পষ্টভাবে দোষারোপ না করে একথা বলা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগসমূহের অন্যান্য বিভাগসমূহে যারা কর্মরত আছেন তাদের মতোই ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার

সাথে সম্পৃক্ত কর্মীবাহিনীর মধ্যে একাগ্রতার অভাব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সময় যে সব শর্তাবলী মেনে নিয়ে একজন কর্মী প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের নিঃস্বার্থ সেবা প্রদানের যে ওয়াদা করেন তা যদি তিনি তার কর্মজীবনে যথাযথভাবে পালন করেন তবে ভূমি ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য নির্দেশিকা

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) (১৯৯৩) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭৭৪-১৯৭১), অর্থনৈতিক ইতিহাস। ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। (দ্বিতীয় খন্ড)

উমর, বদরুদ্দিন (১৯৭৪) *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো বাংলাদেশের কৃষক* । ঢাকাঃ সুবর্ণ প্রকাশনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৩) *ভূমি সংস্কার কমিটি প্রতিবেদন* । ঢাকাঃ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস ।

কাদের, মুহাম্মদ আব্দুল (১৯৯৬) ভূমি আইনের মৌলিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা। *লোকপ্রশাসন সাময়িকী*, ৫ম সংখ্যা। ঢাকাঃ বিপিএটিসি।

ভূমি প্রশাসন বোর্ড (১৯৮৭) *ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল*। ঢাকাঃ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়।

ভূমি মন্ত্রণালয় (১৯৯০) *ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল*। ঢাকা: বাংলাদেশ।

মামুন , মুনতাসির (সম্পাদিত) *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংগালী সমাজ*। ঢাকা।

মিয়া, আব্দুল কাদের (১৯৮৯) *ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা* । ঢাকাঃ কাশবন মুদ্রায়ন।